অনুবর্তন ঃ উপন্যাসে বিভূতিভূষণের শ্রেণী চরিত্রের উন্মেষ

পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

খোলা বাজার অর্থনীতিতে অন্যান্য বিপননযোগ্য সামগ্রীর মতো সাহিত্যও এক বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী। যে কোন ভাষাতেই লিখুন না কেন, সাহিত্যিকের আজ একমাত্র ধ্যেয় 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। 'আর এই সোনার হরিণলাভ রূপ মনোবাঞ্ছা পূরণ ঘটে তখনই যখন কোন ঔপন্যাসিক বড় আদরের ধন 'বেস্টসেলারে'র তকমাটা একবার গায়ে সাঁটতে পারেন। এবং ঐ তক্‌মা যত দীর্ঘদিন গায়ে সেঁটে রাখা যায় ততই তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরে ওঠে। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই লেখার অবতারণা, তার ক্ষেত্রে সিনারিয়োটা অন্য রকম ছিল। শরদুত্তর বাংলা উপন্যাসের লাগাম নিঃসন্দেহে দুই দশক ধরে তিন বাঁড়ুজ্জের করায়ত্ত ছিল। সাহিত্য কীর্তিতে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক, এদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট, এ আলোচনার জন্য ভিন্ন কোন লেখা নির্দিষ্ট কিন্তু আমি এ কথাই বলতে চাই যে সেই আমলে যখন প্রচার মাধ্যমের আলোক প্রক্ষেপণ এমন জোরালো ছিল না, যখন খোলাবাজার অর্থনীতি ব্যাপারটা অজানা ছিল, তখন ঐ তিন ঔপন্যাসিকের খ্যাতিলাভ একথাই প্রমাণ করে যে সুধী পাঠকসমাজ এঁদের লেখায় সদর্থক অন্তর্নিহিত কোন মূল্যের খোঁজ পেয়েছিলেন, যার ফলে প্রিয়জনের মতো কোল দিয়েছিলেন, সাদরে ঘরে নিয়েছিলেন এঁদের। আর এই তিনের মধ্যে বিভূতিভূষণই উঠে আসেন পাদপ্রদীপের সামনে, কারণ তাঁর এক স্বল্প - পঠিত উপন্যাসই রয়েছে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রভূমিতে।

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যজগতে ড: জনসন এমনিই বড়মাপের মানুষ ছিলেন, কিন্তু বসওয়েল উপস্থাপিত তাঁর জীবনীভাষ্য মানুষটাকে আমাদের সামনে আরও অনেক বড় মাপের করে উপস্থিত করে। তেমনি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালি'র মাধ্যমে আমাদের যে প্রীতি লাভ করলেন তা বহুগুণ বেড়ে গেল যখন সত্যজিৎ রায় অপু ট্রিলজিকে আমাদের সামনে রূপালি পর্দায় হাজির করলেন। বিভূতিভূষণের খ্যাতি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক যোজন দূরে বিস্তৃত হলো। শুধু অপু -ট্রিলজিই নয়, 'অশনি সংকেত' 'আদর্শ হিন্দুহোটেল' আরণ্যক' চলচ্চিত্রায়নের মাধ্যমে বিবূতিভূষণের খ্যাতি বাড়িয়েছে অনেকখানি। এবং এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে প্রচার মাধ্যমের প্রসাদ যে উপন্যাস যত অধিক পরিমানে পাবে, সেই উপন্যাস তত বেশি পাঠকের জানা, পড়া ও পর্যালোচনার কেন্দ্রভূমিতে এসে পড়বে। 'অনুবর্তন' এমন একটি উপন্যাস যার ওপর প্রচার মাধ্যমের অকৃপণ দাক্ষিণ্য বর্ষিত হয়নি কিংবা এ উপন্যসের এমন মনমোহিনী ক্ষমতা নেই যে পাঠকমনকে নরম মাটির তালের মতো মেনে একাকার করে দিতে পারে। সুতরাং বিভূতি - উপন্যাস নিয়ে গবেষণা নিরত কোন বিশেষজ্ঞই হয়তো শুধু খবর রাখেন, 'অনুবর্তন' বলে বিভূতিভূষণের এক উপন্যাস আছে। কিন্তু নানা কারণেই 'অনুবর্তন' বিভূতিরসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। Wordsworth প্রকৃতির কবি। প্রতি কবিতায় শুধু প্রকৃতির নামগান। কে ভেবেছিল সেই তিনি 'Upon Westminster Bridge' এ ইঁট পাথর সিমেন্ট দিয়ে তৈরী লণ্ডনের স্তুতিতে অমন আত্মহারা হয়ে পড়বেন? 'অনুবর্তন' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণের ভূমিকাও সম্ভবত: এইরকম। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের গায়ের জামাতে প্রকৃতি - প্রেমিকের লোগো সাঁটা রয়েছে। যাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই নদীনালা, বন-বাদাড়, গাছ পালা, ঝোপঝাড়, গ্রাম বাংলার Pristine quality নিয়ে উপস্থিত। তিনি কেমন করে 'অনুবর্তনে'র মতো উপন্যাস লিখলেন, তাই ভেবে অবাক হতে হয়। এ উপন্যাস একান্তই কলকাতাকেন্দ্রিক খাস কলকত্তাইয়া, যেখানে বিরাজ করছে।

ইটের পর ইট, মাঝে মানুষ কীট
নেইকো ভালোবাসা, নেইকো দযামায়া।

'অনুবর্তন' বিভূতিভূষণের একাদশতম উপন্যাস। এবং এ পরিসংখ্যান থেকে এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ঔপন্যাসিক হিসাবে বিভূতিভূষণ এ উপন্যাস লেখার আগে শিক্ষানবিশী যুগটা পার হয়ে এসেছেন। অর্থৎ ঔপন্যাসিক হিসাবে লেখায় মুন্সিয়ানা এসেছে। ১৯২৯ সালে 'পথের পাঁচালি' প্রকাশের সাথে সাথে বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি তার আদিম দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে ধরা পড়ল এখানে। 'অপরাজিত'তে অপু শহুরে হয়, কিন্তু তবু লেখকের আঁতের ঘরটা যে গ্রামীণ প্রকৃতিতে বাঁধা আছে, তা বুঝতে দেরী হয় না। 'অনুবর্তনে'র প্রেক্ষাপট নির্ভেজাল শহুরে। প্রক্ষিপ্ত অংশের মতো গ্রামীণ ছবি দু'একবার এসে পড়েছে বটে, কিন্তু তা শহরকেন্দ্রিক যে জীবন প্রবাহ এখানে বিধৃত হয়েছে, তাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি।

'অনুবর্তন' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে (যদিও সার্থক অর্থে এ উপন্যাসে কোন প্লট বিদ্যমান কিনা সন্দেহ আছে) বিরাজ করেছে মধ্য কলকাতার একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, যার নাম মডার্ণ ইনস্টিটিউশন। মূল ঘটনা প্রবাহ গড়িয়ে গিয়েছে গাছের শাখা-প্রশাকা বিস্তারের মতো স্কুলের ভেতরে ও বাইরের অংসখ্য খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে খণ্ড খণ্ড এই ঘটনাপ্রবাহকে অনেকসময় অ-সংযুক্ত বিচ্ছিন্ন হিসাবে ভাবার অবকাশ রয়েছে। যেন সিনেমার পর্দায় পরপর ভেসে ওঠা চমকদার মন্তাজ। কিন্তু মানুষের শরীরে যেমন অসংখ্য শিরা, উপশিরা, ধমনীতে প্রবাহিত রক্তপ্রবাহের উৎস চলমান হৃৎপিণ্ড, তেমনি অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহে সমাহারে সংগঠিত এই উপন্যাসের যে গল্পের ধাঁচা, তা কিন্তু নিঃসংশয়ে গড়ে উঠেছে, মডার্ণ ইনস্টিট্যুশনকে কেন্দ্র করে। তারাশঙ্কর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে একটা অত্যন্ত দামী মন্তব্য করেছেন। উনি বলেছেন : দেশমাতৃকা কোন জড় পদার্থ নয়, তাকে খুঁজতে হবে দেশের জনসমষ্টির মধ্যে, মানব সমাজের মধ্যে। একইভাবে মর্ডাণ ইনস্টিটিউশন তো ইট সিমেন্ট বালি কাঠের তৈরী নিছক এক অট্টালিকা নয়, তার নাড়ী বুঝতে হলে বুঝতে হবে তার শিক্ষককুলকে, তার ছাত্র সমষ্টিকে, তার চলমান জীবন স্পন্দনকে। আর এ কাজটাই বিভূতিভূষণ সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন 'অনুবর্তন' উপন্যাসে। এখানে রয়েছে একদল শিক্ষক, যারা শুদু বয়সেই নয়, চরিত্রে, মেজাজে মানসিকায় একে অনেক থেকে আলাদা। এখানে রয়েছেন প্রৌঢ় অকৃতদার নরায়ণবাবু, যাঁর কাছে শিক্ষাদান আর পাঁচটা পেশার মতো এক সাধারণ পেশা নয়। এ তবু স্কুলঘরের চার দেওয়ালের

মধ্যে রুটিন মাফিক পড়ানো নয়। কিশোর বয়স্ক বালকদের সার্থক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজ। তাঁর কাছে আদর্শপুরুষ পূর্বতন হেডমাস্টার অনুকূলবাবু। সার্থক শিক্ষানুরাগী নারায়ণবাবুও যেমন রয়েছেন তেমনি এখানে রয়েছেন আদর্শের সাথে সম্পর্কশূন্য ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, হেডপণ্ডিত, শ্রীশবাবু ইত্যাদি। রয়েছে নবাগত তরুণ স্পষ্টবক্তা, রামেন্দ্রবাবু। আর রয়েছে শিক্ষকদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর অভ্যস্ত হেডমাস্টারের বিশ্বস্ত সহচর আলম সাহেব। এই শিক্ষক রেজিমেন্টের মাথায় বসে রয়েছেন ক্লার্কওয়েল সাহেব, নৈবেদ্যের শীর্ষে স্থাপিত কাঁঠালি কলার মতো। যদিও অধস্তন শিক্ষকদের মাঝে ক্লার্কওয়েল সাহেবের আচরণ প্রভুত্বমূলক এবং মাঝে মাঝে অশোভনভাবে অমানবোচিত, কিন্তু একটা কারণেই তার সব দোষ ক্ষমা করা যায়। ক্লার্কওয়েল সাহেবের ক্ষেত্রে বহুব্যবহৃত শ্লোকটাকে একটু বিকৃত করলে বালা যায় : শিক্ষা স্বর্গঃ শিক্ষা ধর্মঃ শিক্ষা হি পরমং তপঃ। জানি না বিভূতিভূষণের সাদা চামড়ার প্রতি বিশেষ কোন দুর্বলতা ছিল কিনা, কিন্তু ক্লার্কওয়েল সাহেবকে আঁকতে গিয়ে বিভূতিভূষণ তাঁকে প্রায় তুলনাহীন ছাত্রস্বার্থ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী এক আপোষহীন সংগ্রামী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। কালিমাশূন্য এই চরিত্র। বিবূতিভূষণের চেতনা সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট ছিল এমন অভিযোগ তাঁর অতি বড় শত্রুও করতে পারবে না। মিঃ আলমকে আঁকতে গিয়ে বিভূতিভূষণ কখনই তার মূসলমান হওয়াটাকে উল্লেখ্যের মধ্যে আনেন নি। কিন্তু চরিত্র হিসাবে মি: আলম যে বিভূতিভূষণের নেক্‌নজরের ব্যক্তি ছিলেন, এটা মনে করার কোন কারণ নেই। প্রাথমিকস্তরে ক্লার্কওয়েলও আলম যৌথভাবে এক শৃঙ্খলা নিয়মক শাসকগোষ্ঠী হিসাবে উপস্থিত হয় এবং দুজনের মানসিক Orchestration লক্ষ্য করে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সুবাদে কেন জানি না দুজনকে মিলটনের আংকা স্যাটান ও বিলজিবাবারে আধুনিক অনুলিপি বলে মনে হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মি: আলমের মধ্যে এক অনৈতিক, অশুভ আঙিনা বদলের পদক্ষেপ লক্ষ্য করি। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ইস্কুল হতে উৎখাত করার জন্য পর্দার অন্তরালে হীন ষড়যন্ত্রমূলক যে চক্রান্ত, তাতে মি: আলমকে অগ্রনীর ভূমিকা নিতে দেখে তার সততা নিয়েই আমাদের মনে সন্দেহ জাগে।

শিক্ষককূলের সবাই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিক্ষেপের চৌহদ্দিতে এলেও অস্বীকার করার উপায় নেই তাঁর দৃষ্টিক্ষেপণের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রধান দুই শিক্ষকচরিত্র ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবু। উপন্যাসের অর্ধেক জুড়ে তো এদেরই কথা। বিভূতিভূষণ অচঞ্চলভবে আলো ফেলেছেন দুই চরিত্রের ওপরে, এদের শিক্ষকতাকালীন ইস্কুলের পরিবেশে এবং ইস্কুলের বাইরে এদের পারিবারিক জীবন প্রবাহে। প্রশ্ন জাগে, এই দুই চরিত্রের প্রতি এতো গুরুত্বপ্রদান কেন? পরিমল গোস্বামী 'অনুবর্তনে'র আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে এই দুই চরিত্রেই শিক্ষক বিভূতিভূষণের স্বীয় সত্তার ভগ্নপ্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব ধর্মে এইরকম কথা আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে আস্বাদন করার জন্য হলদিনী শক্তিরূপ রাধার সৃষ্টি করেছিলেন। বিভূতিভূষণ এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মতো বিশেষ কোন বোধের দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন কিনা, তা একান্তেই মনস্তাত্ত্বিক গবেষনার বিষয়।

বাংলায় একটা প্রবচন আছে : অভাবে স্বভাব নষ্ট। যদুবাবুর চরিত্র আঁকতে গিয়ে বিভূতিভূষণ সম্ভবত: এই প্রবচনের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। বীভৎস দারিদ্র সেখানে ভয়ালবাস্তব সত্য, সেখানে রুচিবোধ, পরিশীলতা, সমাজ নির্দিষ্ট সততা বড়ই বেমানান। আর যদুবাবুর চরিত্র আঁকতে গিয়ে বিভুতিভূষণ এই সত্যটাকেই আমাদের কুইনাইন গেলানোর মতো গিলিয়েছেন। আজকের স্ফীত মাস মাইনের নিশ্চয়তার মধ্যে যে মাস্টারমশাইরা ন্যায় - নীতি ও সমাজ প্রশংসিত পরিশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে যদুমুখুজ্জের মতো চরিত্র আঁকার জন্য বিভূতিভূষণকে ছ্যা: ছ্যা: করেন। নারায়াণবাবুকে বাদ দিলে যদুমুখুজ্জে স্কুলের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক। একসময়ে গ্রাম বাঙলায় যদুবাবুর ভিটেমাটি থাকলেও আজ তার ছিটেফোঁটা নেই। কলকাতায় সরুগলিতে এক কুঠুরির ছোট্ট ভাড়াটে ঘরে সন্তানহীন দাম্পত্য জীবন যদুবাবুর। শিক্ষকতা কোন আদর্শ নয়। নিছকই জীবিকার পাথেয় তার কাছে। সামনে কোন উদ্দেশ্য না থাকায় জীবনের শুধুই প্রাণ ধারণের জন্য। সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দন্ডে দন্ডে ক্ষয়' জাতীয় কোন আন্তর তাড়না নেই এখানে। এ যেন ঊষর মরুভূমিতে খরতপ্ত মধ্যহ্নে মালবোঝাই গাড়ী সমেত কোন উটের দীর্ঘপথপরিক্রিয়া। যদুমুখেজ্জেকে যেভাবে বিচিত্র করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় লোকটি নৈতিকতাহীন ফাঁকিবাজ এক মানুষ। মিথ্যাবাদী, তথা ছোটখাটো অন্যায় কাজেও দ্বিধাহীন। ছেলেদের ছুটির দিন জ্যু দেখাতে নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের পয়সায় চপ কাটলেট খাওয়া, অনিরুদ্ধ দেখে ফেলায় তাকে খাইয়ে এবং হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে নিজের কুকর্মের সাক্ষীর মুখ বন্ধ করা যদুবাবুর হীন নৈতিকতারই পরিচয় বহন করে শিক্ষাদানে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, পড়ানো থেকে পরীক্ষার খাতা দেখা, সব কাজেই তার চরম গাফিলতির জন্য আমরা তাকে বারবার ক্লার্কওয়েল সাহেবের কাছে তিরস্কৃত হতে দেখেছি। বিভূতিভূষণের সময় শিক্ষকদের অবস্থা হত দরিদ্র ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদুবাবুর মতো হা-ঘরে অবস্থা বোধহয় কারও নয়। ভাড়টে বাসায় যদুবাবুর অস্থাবর সম্পত্তির অবস্থা এমনই করুণ যে গ্রীষ্মের বন্ধে যদুবাবু স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে দূর সম্পর্কের ভাই অনাদির বাড়ী বেড়াতে যেতে চাইলে বাড়ীওয়ালা ভরসা পায় না যদুবাবু ঘরে রেখে যাওয়া অস্থাবর সম্পত্তির টানে দীর্ঘদিনের বাড়া বাকী ফেলা এ বাসায় আর ফিরবে কিনা। শাহুরিক অন্য কোন গুণ হোক না হোক, চালবাজিটা যদুবাবুর ভালই রপ্ত হয়েছে। তাই গ্রামে গিয়ে অনাদির কাছে নিজেকে একটা কেউকেটা হিসাবে উপস্থিত করে সে, যার ফলে অসচ্ছল সংসারের কর্তা অনাদি যদুবাবুর সাথে এক বাঘবন্দী খেলায় নিয়োজিত হয়। জীবনসঙ্গিনী সম্বন্ধে যদুবাবুর ধারণা ভালবাসাহীন নিস্করুণ এক স্বার্থপরের। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নায়ক পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যের ধূয়ো তুলে তীর্থভ্রমণটা একা সারতে পারে। কিন্তু কবিতায় এমন ব্যঞ্জনা কোথাও নেই যে পতিদেবটি পত্নীর প্রতি প্রেম নিবেদনে নিতান্তই কৃপণ এবং দাম্পত্যজীবনে বিসদৃশভাবে উদাসীন। যদুবাবু এ ব্যাপরে এক অনন্য চরিত্র। সংসার ব্যয় লঘু করার মানসে আপন স্ত্রীকে এক আত্মীয়ের বাড়ী নিতান্তই গলগ্রহ করে ফেলে আসে এবং স্ত্রীর অসংখ্য আকুতি মিনতিপূর্ণ চিঠিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কলকাতার মেসে সুখময় একক জীবন যাপন করে। যদুবাবু নিঃসন্দেহে শিক্ষক চরিত্র হিসাবে টাইপ না করে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। কিন্তু উপন্যাসের শেষে যদুবাবুর মৃত্যুকে ঘিরে বিভূতিভূষণ যে কারুণ্যের সৃষ্টি করেন, মনে হয় না তা সঙ্গত বা যথাস্থানে ন্যস্ত।

ক্ষেত্রবাবুকে নিয়েও বিভূতিভূষণের শিরঃপীড়া কম নয় আর সেটা মালুম হয় যখন দেখি যদুবাবুর দাম্পত্যজীবনের মতো ক্ষেত্রবাবুর অন্দরমহলেও তাঁর দৃষ্টিক্ষেপণের চৌহদ্দি প্রসারিত হয়েছে। মিলটন প্যারাডাইস লস্টে শয়তানের দোসর বিলজীবাব

সম্বন্ধে বলেছেন : Next in power and next in crime। যদুবাবুর প্রেক্ষিত ক্ষেত্রবাবু সম্বন্ধেও সম্ভবত: একই কথা বলা যায়। ক্ষেত্রবাবুর চরিত্রও প্রায় একই ফর্মায় গড়া, তফাতের মধ্যে স্বরটা একটু নীচু সুরে বাঁধা। এখানেও সেই একই জীবন দর্শন কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়। স্কুলের মাসমাইনেতে সংসার ব্যয় নির্বাহ না হওয়ায় উপরি আয়ের জন্য, গৃহশিক্ষকের কর্ম সম্পাদন। কিন্তু যদুবাবুর সাথে ক্ষেত্রবাবুর পার্থক্যও আছে। যদুবাবুর তুলনায় ক্ষেত্রবাবু বয়সে নবীনতর। শুধু তাই নয়, সেখান সন্তানহীন দাম্পত্যজীবন যদুবাবুর ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিকটু খণ্ডহারের মতো, ক্ষেত্রবাবু পার্থক্যও আছে। যদুবাবুর তুলনায় ক্ষেত্রবাবু বয়সে নবীনতর। শুধু তাই নয়, যেখানে সন্তানহীন দাম্পত্যজীবন যদুবাবুর ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিকটু খণ্ডহরের মতো। ক্ষেত্রবাবু প্রথম বিবাহেই তিন সন্তানের জনক। কিন্তু স্ত্রী নিস্তারিনীর অসুখকালীন তার ব্যবহার এত উৎকট, বেমানান ও আত্মকেন্দ্রিক যে আমাদের সন্দেহ জাগে বহিরঙ্গে মানুষের খোলস ছাড়া ক্ষেত্রবাবুর মধ্যে মানবিক গুণ আদৌ কিছু আছে কিনা। বিছানায় পড়ে থাকা নিস্তারিনীর অভাবে যেভাবে ক্ষেত্রবাবু সাত বছরের মেয়েকে বাসনমাজা থেকে শুরু করে রান্না করা পর্যন্ত সমুদয় ঘরের কাজ দিনের পর দিন করিয়েছে, তাতে ধারণা হয় পিতৃস্নেহ তো দূরের কথা, মনুষ্যত্ববোধের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও ক্ষেত্রবাবুর মধ্যে নেই। নিস্তারিনী গতাসু হওয়াতে ক্ষেত্রবাবু যে বিশেষ শোকাহত হয়েছে একথা চিন্তা করার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ দারিদ্র নিপীড়িত ক্ষীণযৌবনা নারীর হাত হতে নিস্কৃতি ক্ষেত্রবাবুকে উদ্ভিন্নযৌবনা কোন যুবতীর পাণিপীড়নের সুযোগ করে দিয়েছে। এবং বিভূতিভূষণ স্বল্প পরিসরে হলেও বেশ গুছিয়ে ক্ষেত্রমোহন-অনিমা প্রাক-বিবাহকালীন রোমান্স বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ পরবর্তী ক্ষেত্রবাবুর মধ্যে চরিত্রগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি আমরা। দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়সের গুণেই হোক, বা ব্যক্তিত্বের গুণে ক্ষেত্রবাবু সংসার সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনিমার সাথে আলোচনা করেছে এবং অল্প পরিমানে হলেও স্ত্রৈনতার শিকার হয়েছে। যুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়বে এই ভয়ে ক্ষেত্রবাবু যখন পরিবারের সকলকে নিয়ে বহুপূর্বে পরিত্যক্ত গ্রামের নিজ বাসাতে ফিরে এসেছে, তার মধ্যে আমরা কিছু কিছু মানবিক গুণের আভাস দেখতে পেয়েছি এবং এখানেও অনিমার সুপরামর্শের ওপর নির্ভরতার গুণেই ঘটেছে বলে আমাদের ধারণা।

কিছুদিন হোল সাহিত্য জগতে 'দলিত সাহিত্য' নামে এক নব ধারায় সৃষ্টি হয়েছে। এবং দলিত সাহিত্যের পৃথক বর্গীকরণের সাপক্ষে মনোহর বিশ্বাস নামে এক বিদগ্ধ সমালোচক যে সওয়াল করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। উনি বলেছেন সার্থক অর্থে দলিত সাহিত্যের স্রষ্টা তিনিই যিনি গাঁঞি গোত্র মিলিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। এবং যেহেতু তিনি রক্তের সম্পর্কে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই দলিত সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি Sympathy নয়, empathy র আমদানী করেন। আর এর ফলে দলিত সাহিত্য তার সঠিক প্রেমিসেসে এসে দাঁড়ায়। যদিচ এমন বক্তব্য ভুল dialectics সঞ্জাত, তথাপি এরকম যুক্তিতে বিশ্বাস রাখলে বিভূতিভূষণকে শিক্ষক সংক্রান্ত উপন্যাসে সেরা ঔপন্যাসিক হিসাবে ধরে নিতে কোন বাধা থাকে না, কারণ উনি শিক্ষকতা করেছেন, 'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' এখানে তো শিক্ষকজীবন বিভূতিভূষণের জীবন দিয়ে উপলব্ধ। একটা ব্যাপারে কিন্তু 'অনুবর্তন' আমাদের এক অস্বস্তিকর পরিবেশে ফেলে দেয়। যে বিভূতিভূষণকে আমরা প্রকৃতিপ্রেমিক আধ্যাত্মচেতনাকাঙ্ক্ষী এক আপনভোলা ভালো মানুষ হিসাবে জানি, সেই বিভূতিভূষণকে আমরা 'অনুবর্তনের' প্রেক্ষিতে অন্য এক চোখে দেখতে শুরু করি। যদি যদুবাবু বা ক্ষেত্রবাবু বিভূতিভূষণেরই প্রতিলিপি হয়, তাহলে তো শিক্ষক তথা মানুষ বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা শেষ নীচে নেমে যায়। এক ফাঁকিবাজ আত্মসর্বস্ব আদর্শবিহীন ন্যুব্জমনা মানুষ হিসাবে কি বিভূতিভূষণ ধরা পড়েন না আমাদের চোখে?

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করবো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'অনুবর্তন' এক অপরিসীম মূল্যবান উপন্যাস। বাংলার বিশ শতকের শিক্ষকজীবনের ইতিহাস লিখবেন যিনি, তাঁ কাছে তো 'অনুবর্তন' এক বিশেষ মূল্যবান দলিল। প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন শিক্ষককুলের আর্থ-সামাজিক পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক জীবনের ছবি এমন স্পষ্ট স্বচ্ছতায় আর কোথায় ধরা পড়েছে? অত্যন্ত দীন মাসমাইনে, তাও মেলে সাপ্তাহান্তিক কিস্তিতে কিস্তিতে। পুরো মাইনে মেলে না কোন মাসেই। বকেয়া জমতে থাকে এবং শেষে তা তামাদি হয়ে যায়। শিক্ষকদের শুধু পঠন - পাঠনেই ব্যস্ত থাকলে চলে না। সাথে ইনসিওরেন্স এজেন্টের মতো স্কুলে ছেলে ধরে রাখা এবং অন্য স্কুল থেকে ছেলে ভাঙিয়ে নিয়ে আসার মতো কাজেও নিয়োজিত হতে হয়। প্রাইভেট ট্যুইশান ব্যাপারটা যা আজ সারা বাংলা ব্যাপী এক ব্যাপক কুটির শিল্পের রূপ নিয়েছে, প্রাক স্বাধীনতাকালীন সমাজের স্তরে অস্তিত্ব অলক্ষিত ছিল না কিন্তু ধারণাটা ছিল আলাদা। আজকের 'হাইটেক' যুগে শিক্ষক তাঁর নিজের বাড়ীতে বা ভাড়া করা প্রশস্ত হল ঘরে আধুনিক সব প্যারাফারনেলিযার সাহায্য নিয়ে একইসাথে ১৫/২০ বা আরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে কোচিং দিচ্ছেন এবং সেই সুবাদে মাসান্তে অর্থাগমও ঘটেছে ভালো রকম। তখনকার অতি স্বল্প মাইনের শিক্ষকের ভাড়াটে বাড়ীতে ছাত্রপড়ানোর জায়গা তো দূরস্থান, পরিবার নিয়ে মাথা গোঁজার স্থানেরই সন্ধুলান হোত না। সুতরাং কিঞ্চিৎ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধনীগৃহে গিয়ে গৃহশিক্ষার কার্যসম্পাদন করা এবং মাস গেলে উপরি কিছু অর্থও যেন পাওনা ছিল, তেমনি পাওনা ছিল অভিভাবকের নানা কটু-কাটব্য। বিভূতিভূষণের লেখায় একটা জিনিস না লক্ষ্য করে উপায় নেই। সামাজিক কোন ঘটনা যা তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, তিনি তা উপন্যাস নির্বিশেষে ছবির মতো এঁকেছেন। এবং সর্বত্রই তা প্রায় documentation -এর পর্যায়ে পড়েছে। ১৩৫০ সালের বাংলার মন্বন্তর তিনি 'অশনিসংকেত' ও বেশ কিছু ছোটগল্পে অনুপুঙ্ক্ষ চিত্রিত করেছেন। 'অনুবর্তনে' ও সামাজিক এক ঘটনা তাঁর বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এসে পড়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কলকাতার অবস্থা। জাপান কলকাতায় বোমা ফেলবে এরকম এক ত্রাস কলকাতাবাসীদের গ্রাস করে ফেলে যার ফলশ্রুতি হাজার হাজারে মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সামান্য কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সম্বল করে কলকাতা হতে যতদূরে পেরেছে পালিয়েছে। 'অনুবর্তন' উপন্যাসে এই Panicky অবস্থা ও তার প্রতিক্রিয়া এমন ব্যাপক স্পষ্টতায় ধরা পড়েছে যে সন্দেহ হয় কোন আলোকশিল্পীও একাজ এমন নিপুণভাবে করতে পারতেন কিনা। আর এ ব্যাপারে বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

বিভূতিভূষণ প্রশ্নাতীতভাবে এক বড় শিল্পী। মানুষকে দেখেছেন তাঁর ভালবাসা দিয়ে। সহমর্মিতা দিয়ে। কিন্তু তবু অন্যান্য

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যেমন 'অনুবর্তনের ক্ষেত্রেও তেমনি এক তীব্র আক্ষেপ রয়ে যায় আমাদের মনে। এখানে এবং অন্যত্র আমরা তাঁর কোন্ সমাজচৈতন্যের প্রকাশ দেখি? বিভূতিভূষণ নিয়ে যেকোন আলোচনা তাঁর সমাজচৈতন্যের ব্যাপারটা অতি সযত্নে Shield করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই আর সেই কারণেই বড় বেশি করে আলোকপাত করা হয় তাঁর প্রকৃতি প্রেম তথা আধ্যাত্ম - চেতনার ওপর। যেন ওগুলোই যথেষ্ট, শ্রেণীচৈতন্য ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে?' The truth must come out। 'অনুবর্তনে' শিক্ষক নামক যে ব্যক্তসমুদয়কে বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তাদের মধ্যে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু পাচ্ছি হেডপণ্ডিত, মি আলম, নারায়ণবাবু এঁরা প্রত্যেকেই তৎকালীন বাঙালী সমাজের শিক্ষিত মানুষ। শিক্ষা মানুষকে চৈতন্য দান করে। কিন্তু এই সব শিক্ষক যাঁরা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, এঁরা কোন্ চৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন? এদের কারো মধ্যে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সামাজিক চৈতন্যের কোন স্ফূরণ দেখেছি? দ্বান্দ্বিক চেতনা সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপার, বিশেষ, বিশেষত: শিক্ষিত মানুষের কাছে। আর যে সময়ের প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাস লেখা, তখন শুধু শিক্ষিতলোকই নয়, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের কাছেও পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে লড়াই প্রধান দ্বান্দ্বিক চেতনা হিসবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের ব্যাপার, বিভূতিভূষণ যদুবাবু বা ক্ষেত্রবাবু বা অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে বিন্দুমাত্র এ জাতীয় চৈতন্যের স্ফূরণ ঘটাননি। তার জাপানীবোমার ভয়ে আতঙ্কিত যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর কলকাতা হতে পালানোর যে ছবি বিভূতিভূষণ এঁকেছেন, তাতে এদের মানুষ না বলে চৈতন্যবিহীন কেন্নো জাতীয় জীব বলাই তো শ্রেয়। দ্বিতীয়ত ঃ এই জাতীয় নিঃস্ব অতি দরিদ্র শিক্ষিত মানুষের মনে শোষকের সাথে শোষিতের লড়াইয়ের যে চৈতন্য মূর্ত হতে উঠতে পারতো সহজেই, বিভূতিভূষণ তার ধারে কাছে দিয়ে যান নি। তৃতীয়ত ঃ 'অনুবর্তন' এক ছন্নছাড়া আদর্শহীন যূথবদ্ধ মানুষের ছবি। আর আদর্শ চিন্তাটা আসে সমাজচৈতন্য হতে, এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা এই শিক্ষক সম্পর্কিত তাঁরাশঙ্করের উপন্যাস 'সন্দীপন পাঠশাল'র কথা স্মরণ কির। যদিও তারাশঙ্কর নিজ শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে সীতারামের জীবন চৈতন্য এক পূর্বাপর সাযুজ্যহীন ভুল dialectics-এর ওপর গড়ে তুলেছেন, কিন্তু যেটা প্রশংসার যোগ্য তা হোল এই উপন্যাসের কাঠামোটাই গড়ে উঠেছে এক আপোসহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে— বর্ণের সাথে বর্ণের লড়াই, উচ্চবর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই আপাত শ্রেণীচৈতন্য ঔদাসীন্যকে আমরা কীভাবে বিশ্লেষণ করবো? কোন শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই নিজ শ্রেণীচৈতন্য নির্বিকার হওয়া সম্ভবপর নয় এবং বিভূতিভূষণও তা ছিলেন না তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে আঁকা বিভিন্ন প্রধান পুরুষ চরিত্র আমাদের মনে বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে এক অপ্রিয় ধারণার সৃষ্টি করে। পথের পাঁচালি'র হরিহর 'অশনি সংকেত' এর গঙ্গাচরণ কিংবা 'অনুবর্তনের' যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু এরা কী ধরণের চরিত্র? উপরোক্ত প্রথম দুজনকে গায়ে ধর্মের নামাবলী জড়ানো নিছক পরগাছা ছাড়া অন্যভাবে ভাবা যায়? ছাত্রজীবনে যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু বহুবার মন্ত্রোচ্চারণের মতো অসতো মা সদ্গময় শ্লোকটা আওড়েছেন। কিন্তু কর্মজীবনে কখনও ধ্যেয় motto হিসাবে গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ ফেরেববাজী, ও অন্যান্য অসাধুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। এদের Social dregs ছাড়া অন্যভাবে ভাবা যায় না। প্রশ্ন ওঠে বিভূতিভূষণ একের পর এক এই ধারণের চরিত্র কেন সৃষ্টি করেছিলেন? একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো ধীরে দীরে সুখসাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি, বর্ণাভিমান, নাম যশ লাভ বিভূতিভূষণকে তাঁর সমকালীন শোষক - শোষিতের সমাজকে স্বাভাবিক ও অনুমোদনীয় বলে গ্রহণ করিয়েছে। 'যার যাহা আছে, তার থাক তাই, কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই। তাই তাঁর উপন্যাসে কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি নেই, নেই কোনভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রমুষ্টি আস্ফালন। চলমান সমাজের প্রতি বিক্ষোভহীন আনুগত্য ও দাসত্বের অঙ্গীকার প্রতি উপন্যাসেই পরিস্ফূটমান আর 'অনুবর্তন' তার কোন ব্যতিক্রম নয়।